কোপেনহেগেন পরিবেশ সম্মেলন

‘চেঞ্জ দ্য সিস্টেম—নট দ্য ক্লাইমেট’

গত ডিসেম্বর মাসের বৃহত্তম আন্তর্জাতিক কর্মকাণ্ড কোপেনহেগেনে অনুষ্ঠিত বিশ্ব জলবায়ু সামিট সমাপ্ত হল। দু’বছরের প্রস্তুতি এবং দু’সপ্তাহের মুখোমুখি টানাপোড়েনের পর বলাই যায় যে, কোপেনহেগেনের এই সম্মেলন পুরোপুরি ব্যর্থ। এই সম্মেলন আইনগতভাবে কার্বন ডাই অক্সাইড emission cut বাধ্যতামূলক করতে ব্যর্থ হয়েছে। গরিব দেশগুলোকে রক্ষা করতে আর্থিক অনুদানের সূত্র খুঁজতে ব্যর্থ হয়েছে। কিয়োটো চুক্তি যা ২০১২ পর্যন্ত কার্যকর থাকবে, তার সমপর্যায়ের কোনো চুক্তি আর থাকল না। এই সম্মেলন থেকে দূষণের কোনো সীমারেখা টানা বা তাকে প্রতিরোধ করার কোনো কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া, কোনোটাই হোল না। মাইকেল লোয়ীর ভাষায়, ‘পর্বতের যে মূষিক প্রসব হতে চলেছে, তা কোপেনহেগেন সম্মেলন শুরুর বহু আগেই বোঝা গেছিল। যেটা আগে বোঝা যায়নি, সম্মেলনের শেষে বোঝা গেল, তা হল পর্বত একটা আরশোলার জন্ম দিয়েছে।’

জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশের সমস্যার গভীরতা বুঝতে একটা তথ্যই যথেষ্ট। এযাবৎ কালে অনুষ্ঠিত পরিবেশ সংক্রান্ত বৃহত্তম সম্মেলন, COP15 একমঞ্চে টেনে নিয়ে গিয়েছে সারা বিশ্বের সমস্ত শীর্ষ রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রনেতাদের, সমস্ত দেশের পরিবেশ মন্ত্রীদের, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ও পরিবেশকর্মীদের, সমস্ত গণমাধ্যমের সাংবাদিকদের, রাজনৈতিক কর্মীসমর্থকদের। দু’সপ্তাহ ধরে সমস্যার নানা দিক নিয়ে আলোচনা, বিভিন্ন পক্ষ থেকে তাদের স্বার্থবাহী কোনো একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হবার জন্য আন্তরিকতা প্রকাশ করা, এই সব থেকে সমস্যার তাৎপর্য বুঝতে অসুবিধা হবার কথা নয়। এটা সবাই বুঝতেও পেরেছে। প্রশ্ন হল, তা হলে এই সাধারণ সমস্যাকে মাথায় রেখে সব পক্ষের গ্রহণযোগ্য একটা সাধারণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হল না কেন? এই প্রশ্নের উত্তরের মধ্যেই লুকিয়ে আছে এই সমস্যার কারণ ও তার সমাধানের উপায়।

সমাধান হল না—কারণ কী?

বিজ্ঞানী ও বিশেষজ্ঞদের মধ্যে দূষণের মাত্রা, তার প্রভাব ও ফলশ্রুতি, বিপদের গুরুত্বের প্রশ্নে কিছু ভিন্নমত থাকলেও, সমস্যার সমাধানের কোনো সাধারণ সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষেত্রে সেটা বাধার কারণ ছিল না। বরং সম্মেলন ভেস্তে যাবার পেছনে কারণ ছিল রাষ্ট্রনেতাদের অভ্যন্তরীণ টানাপোড়েন। এক দিকে বারাক ওবামা, গর্ডন ব্রাউনরা, অন্য দিকে মনমোহন সিংহ-ওয়েন জিয়াবাওরা, আরেক দিকে আফ্রিকা, এশিয়া, লাতিন আমেরিকার রাষ্ট্রপ্রধানেরা। এক দিকে উন্নত দেশগুলো, সাম্রাজ্যবাদী শক্তি, অন্য দিকে ভাবী সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি, আরেক দিকে আর্থিক ও রাজনৈতিকভাবে পিছিয়ে-পড়া দেশগুলো। কোপেনহেগেন সম্মেলন চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল, পরিবেশের জন্য সম্মেলন আসলে কোন রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রশক্তি কী নিয়ন্ত্রণ করবে, সেটা নির্ধারণ করার সম্মেলন, জলবায়ু পরিবর্তনকে বিপরীতগামী করার উদ্যোগের সম্মেলন নয়। এই সম্মেলন বুঝিয়ে দিল পরিবেশের বিপদ আর তার সমাধান বিজ্ঞানের বা প্রযুক্তির নয়, বরং রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক।

পরিবেশ ও পুঁজিবাদের সম্পর্ক

পরিবেশের সংকট উন্নয়নের ও প্রগতির স্বাভাবিক ফলশ্রুতি নয় বরং শ্রেণীস্বার্থের অর্থনীতির ফল। পুঁজিবাদী আর্থিক ব্যবস্থার প্রত্যক্ষ ফলশ্রুতি। এটা গুলিয়ে দেবার জন্য বলা কথা নয়। এটা ঠিক যে পরিবেশের সঙ্গে মানুষের সংঘাত অনেক আগেই শুরু হয়েছে। চাষবাসের শুরুতেই তা দেখা গেছে।

উদ্যোগ নেওয়া হলেও, সেগুলোর আসল চেহারা ও সীমাবদ্ধতা নিয়ে পরে চর্চা করব। তবে মৌলিক নীতিটা হল, পরিবেশ দূষণ ঘটলে বা কোন সম্পদ শেষ হয়ে এলে, তাতে পুজির ব্যয় বাড়ে না, মুনাফ তাই এ নিয়ে তাদের ভ্রুক্ষেপ নেই। একটা নমুনা দিলেই ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়ে যাবে। কোপেনহেগেন সামিটে জি-৭ দেশগুলির পক্ষে বারাক ওবামার দেওয়া প্রস্তাবকে চীন সরাসরি খারিজ করে দিয়েছে। প্রস্তাব ছিল, ২০৫০ সালের মধ্যে উন্নত দেশগুলো কার্বন নিঃসরণের পরিমাণ ৮০% কমাবে। চীন ও অন্যান্যরা কমাবে ৫০%।। চীন রাজি না হওয়ার কারণ একটাই, তার উন্নত পুঁজিবাদী দেশে রূপান্তর, ভাবী সাম্রাজ্যবাদী শক্তিতে পরিণত হতে যাওয়া ও বৃহৎ আর্থিক শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করার বাসনা। এবং সেটা চীন পরিবেশকে ধ্বংস করেই করতে চায়। চীন জানে দ্রুততম সময়ে অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জন করার একমাত্র উপায় সম্পদের সর্বোচ্চ ও দ্রুততম ব্যবহার এবং প্রাকৃতিক সম্পদই এক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। ঠিক যেভাবে তিন’শ বছর পরিবেশ ও প্রাকৃতিক সম্পদকে শোষণ করে আমেরিকা ও ইউরোপের বৃহৎ পুঁজিবাদী দেশগুলো বড় হয়েছে। পরিবেশের সমস্যার ক্ষেত্রে প্রাক-পুঁজিবাদী ও পুঁজিবাদী সমাজকালে পার্থক্যটা হল আসলে পরিবেশের আঞ্চলিক সমস্যা ও বিশ্বায়িত সংকটের পার্থক্য। আগের পরিবেশজনিত সমস্যা হত আঞ্চলিক, কোনো অঞ্চল থেকে মানুষ সরে যেত অন্য অঞ্চলে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে ধ্বংস হোত আঞ্চলিক সভ্যতাও। কিন্তু পুঁজিবাদের দান হল পরিবেশের বিশ্বায়িত সংকট।

গোটা গ্রহটা আজ অস্তিত্বের সংকটে ভুগছে, মানবসভ্যতাই ধ্বংসের মুখে। সমুদ্রের জলস্তর, তাপমাত্রা বৃদ্ধি ও জলবায়ুর অদ্ভুত পরিবর্তনে বাংলাদেশ অস্তিত্বের সংকটে। সেখানে ফি বছর বন্যায় মৃত্যু হয় লক্ষাধিক মানুষের। অথচ ব্যাপক হারে বাংলাদেশ প্রাকৃতিক সম্পদের ধ্বংসসাধন করে চলেছে, ব্যাপারটা তেমন নয়। এটা ঘটছে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে বৃহৎ বুর্জোয়া রাষ্ট্র ও কর্পোরেটগুলোর কাজেকর্মে। তাই এটা হল পরিবেশের বিশ্বায়িত সংকট। সব দেশের পুঁজিবাদেরই এক চরিত্র, একই ধরনের কর্মপদ্ধতি। নগরায়নকেই উন্নয়নের মাপকাঠি করা হয়। আমেরিকা, ইউরোপ এক'শ বছর আগেই সেসব সেরে ফেলেছে। এখন তাকে অনুসরণ করছে চীন, ভারত, ব্রাজিলের মতো ভাবী সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো। এইসব দেশের অন্যান্য শহরের সাথে একই তালে কলকাতাতেও তৈরি হচ্ছে অনেক ফ্লাইওভার যাতে বেশি সংখ্যায় ন্যানো গাড়ি চলতে পারে আর টাটাদের মুনাফা বাড়ে। তৈরি হচ্ছে শপিং মল যাতে ম্যাকডোনাল্ডসের চেনফুড ব্যবসা হতে পারে। বহুত্ব, বহুমাত্রিকতা, আঞ্চলিক সংস্কৃতি, খাদ্যাভ্যাস ইত্যাদি তাৎপর্যহীন হয়ে পড়ছে। প্রাচীন শহর হায়দরাবাদ আর আধুনিককালের গড়ে ওঠা ব্যাঙ্গালোর, চন্ডীগড়—আপনাকে সেই Westside, Shoppers Stop থেকেই পোষাক কিনতে হবে। Subway , KFC থেকেই খাবার খেতে হবে। Inox-এই cinema দেখতে হবে, কারণ আগেকার সংস্থাগুলো আর প্রতিযোগিতায় পেরে উঠছে না, ভোক্তা হিসেবে আপনার choice নেই। যা পাবেন তাই তো ব্যবহার করবেন? আঞ্চলিক খাদ্যশৃংখলগুলো ভেঙে যাচ্ছে। একটা উদাহরণ নেওয়া যাক। সামুদ্রিক অঞ্চলের মানুষ খাদ্যের প্রয়োজনে সামুদ্রিক মাছ খেত আর সেটা ছিল আঞ্চলিক খাদ্যশৃংখল। এখন বড় কিছু কোম্পানির দৌলতে সী-ফুড বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয় করে তোলা হয়েছে মুনাফার প্রয়োজনে। যে সব অঞ্চলের মানুষের দৈনন্দিন খাদ্যাভ্যাসে সেসব ছিল না, এখন তা ঢুকে পড়েছে কয়েকটা আন্তর্জতিক সংস্থার দৌলতে। আগে মানুষ বেড়াতে গিয়ে স্থানীয় খাবার খেত, পরখ করত। এখন টিন ফুড হয়ে সারা বিশ্বে বিপণন হচ্ছে। আপাতভাবে শুনতে খারাপ লাগার কথা নয়। কিন্তু বিশ্বব্যাপী কৃত্রিম ভাবে তৈরি এই চাহিদার যোগান দিতে গিয়ে এবং মুনাফাকে সুনিশ্চিত করতে ব্যাপকহারে এই মাছ ও সামুদ্রিক প্রাণী তোলা হচ্ছে। যা ওই অঞ্চলের খাদ্য শৃংখলের পরিপন্থী এবং তার ভারসাম্যকে নষ্ট করছে, বিলুপ্তি ঘটাচ্ছে পারস্পরিক নির্ভরশীল প্রাণীগুলোর, নষ্ট হচ্ছে সামুদ্রিক ও স্থানীয় পরিবেশ। যার প্রভাব কিন্তু আন্তর্জাতিক।

পরিবেশের স্বার্থে শিল্পায়ন ব- করতে হবে?

অর্থনীতির উন্নয়নের গোড়ায় আছে শিল্পায়ন আর তার গোড়ায় আছে জীবাশ্ম জ্বালানীর ই-ন। ফসিল ফুয়েল পোড়ানোর ফলশ্রুতি গ্রীনহাউস গ্যাসের মাত্রাবৃদ্ধি যা গ্লোবাল ওয়ার্মিং-এর মূল কারণ। তবে কি ব- করতে হবে উন্নয়ন, শিল্পায়ন? অবশ্যই নয়। যেটা করতে হবে, তা হল, শিল্পায়ন সম্পর্কে ধারণার পরিবর্তন; মানুষ-প্রকৃতির সম্পর্কের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন। এক্ষেত্রে একটা সংঘাত প্রায়শই দেখা যায় সর্ব্ব। বিশুদ্ধ পরিবেশবাদীরা সঠিক ভাবে কোনো কর্মকাণ্ডের বিরোধিতা করলেও দেখা যায় অনেক ক্ষেত্রে তা স্থানীয় গরিব মানুষের অর্থনৈতিক স্বার্থের বিরুদ্ধে যাচ্ছে। ঐ বিশেষ ক্ষেত্রে পরিবেশবাদীদের দাবি সরাসরি স্থানীয় মানুষের জীবিকার ওপর আঘাত করছে। পুঁজিবাদীরাও এই অবস্থার সুযোগ নিয়ে এক পক্ষকে অপর পক্ষের বিরুদ্ধে লড়িয়ে দিয়ে নিজেদের কাজ হাসিল করে নেয়। সামনেই একটা উদাহরণ রয়েছে। শহর ও শহরতলীর শিক্ষিত বেকার, যাদের কর্মসংস্থানের কোনো উপযুক্ত ব্যবস্থা করতে ব্যর্থ হয়ে সরকার নয়াচরের কেমিক্যাল হাব নিয়ে পরিবেশবাদীদের ন্যায্য প্রতিবাদকে প্রতিরোধ করতে, ওই বেকারদের চাকরির ভুয়ো টোপ দিয়ে প্রভাবিত করতে চাইছে। ব্যাপক অংশের মানুষকে পরিবেশবাদীদের বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়ে কাজ হাসিল করতে চাইছে। যার উদ্দেশ্য ওই SEZ থেকে যাতে DOW, Dupont, Shell এর মতো বৃহৎ রাসায়নিক পেট্রোকেম কোম্পানিরা তাদের মুনাফাকে ধরে রাখতে পারে। উন্নত দেশগুলো চায় দূষণ সৃষ্টিকারী শিল্পগুলো ভারত, ব্রাজিলের মতো দেশগুলোতে স্থানান্তরিত হয়ে যাক। আর বেকার সৃষ্টির হারের তুলনায় চাকরির সংস্থান যে অনেক কম হবে তা বলাই বাহুল্য। কেননা বুর্জোয়া শিল্পায়ন আর বেকারত্বের হার, দুটোই একসাথে বেড়েছে ভারতে, চীনে, সারা বিশ্বে।

মুনাফার প্রয়োজনে চাহিদা সৃষ্টি ও তদনুযায়ী উৎপাদনের বদলে প্রকৃত প্রয়োজন অনুযায়ী উৎ-পাদন হওয়া দরকার। গ্রাম ও শহরের মধ্যে প্রভেদ দূর করে সমস্ত অঞ্চলের সুসম বিকাশ করা দরকার। কৃষ্ণনগর, বর্ধমানের লোক ঘুরতে কলকাতায় আসবে, কাজ করতে, অর্থোপাজন করতে, প্রয়োজনীয় চাহিদা মেটাতে নয়। ওগুলোর সংস্থান ওখানেই থাকবে, তেমন উন্নয়ন করতে হবে। শহরকে অকারণে চাপ নিতে হবে না। বহুতল বাড়ি, প্রচুর গাড়ি দূষণ ঘটাচ্ছে মাটির ওপরে নীচে সর্ব্ব। কেন্দ্রীভূত জায়গায় নেমে যাচ্ছে মাটির নীচের জলস্তর। পরিবার-পিছু থেকে ক্রমশ ব্যক্তি-পিছু গাড়ির বদলে আনতে হবে স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ গণপরিবহন ব্যবস্থা ইত্যাদি। পরিবেশব-ু পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির ব্যবহার বাড়াতে হবে। এগুলো কার্যকর করলে বর্তমান সংকট থেকে উদ্ধার হবার হয়ত কোন উপায় বেরোতে পারে, কিন্তু সেক্ষেত্রে বিশ্বের পুঁজিবাদের স্তম্ভ তেল, রাসায়নিক, নির্মাণ, লোহা ও স্টীল, গাড়ি কোম্পানিগুলোকে তাদের মুনাফার কারবার ব- করতে হবে। বিশ্ব পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় এটা বোধহয় কল্পনা করা অসম্ভব। আর তাই পরিবেশের লড়াইকে সরাসরি পুঁজিবাদের বিরুদ্ধেই লড়তে হবে। পরিবেশবাদী থেকে মেহনতী মানুষ, উন্নত দেশের মানুষ থেকে পশ্চাদপদ দেশের

মানুষ সবাইকেই।

পরিবেশের বিপদ এড়াতে ওবামা, মনমোহন সিংহদের ওপর যে নির্ভর করা যাবে না, কোপেনহেগেন সামিট আরও একবার চোখে আঙুল দিয়ে তা দেখিয়ে দিল। সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর ওপর সেখানকার enlightened মানুষের বিষম চাপ। তাই সেখানকার রাষ্ট্রপ্রধানরা কোনওক্রমে একটা চুক্তি করার চেষ্টা করেছিল। তারা নিজেরা কার্বন নিঃসরণ কমানোর ব্যাপারে তেমন আগ্রহ দেখাতে চায়নি। যেটুকু করছে সেখানেও হিসেবের গরমিল এবং সংখ্যাতত্ত্বের মারপ্যাঁচ করে চলেছে। চীন, ভারত, ব্রাজিল, দক্ষিণ আফ্রিকার মতো দেশগুলোকে বাধ্যতামূলক emission cut করতে চাপ দিয়ে গেছে, অন্যদিকে দূষণমূলক শিল্পগুলোকে এই দেশগুলোতে স্থানান্তরিত করতে উঠে পড়ে লেগেছে। তিন'শ বছর ধরে আফ্রিকা, এশিয়া, দক্ষিণ আমেরিকার গরিব দেশগুলোর প্রাকৃতিক সম্পদ লুন্ঠন করে, বিশ্বপরিবেশের কাছে এবং এই দেশগুলোর কাছে যে ঋণ বহন করছে, উন্নত দেশগুলো তা আর্থিকভাবে মেটাতে কোনো আগ্রহ দেখাচ্ছে না। বিশ্ব জনমতের চাপে প্রতীকি কিছু টাকা দিয়ে দায় সারতে চাইছে। প্রয়োজনীয় টাকা না পেলে ওই দেশগুলোর পক্ষে ব্যয়সাপেক্ষ দূষণ বিবর্জিত প্রযুক্তির প্রয়োগ করা ও তাদের নিজেদের উন্নয়ন করা একরকম অসম্ভব। তাই জি-৭৭ দেশগুলোও ঐক্যবদ্ধ হয়েছে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর বিরুদ্ধে। অন্য দিকে ভারত, চীনের মতো নব্য ও ভাবী সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো কার্যত কোনো ধরণের চুক্তির দ্বারা বাধা পড়তে চাইছে না। মুখে যদিও তারা দূষণ কমানোর কথ া বলছে, তারা নিজেদের উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলোর সমকক্ষ করে তুলতেই বেশি আগ্রহী, আর তা করতেই আন্তর্জাতিক চুক্তির মতো কোনো বাধা মানতে চাইছে না। সব মিলিয়ে কোপেনহেগেন সামিট একটা সার্বিক ব্যর্থ উদ্যোগে পর্যবসিত হয়েছে।

যে উপায়গুলোর কথা এই পুঁজিবাদী দেশগুলোর পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে, সেগুলোকে ভালভাবে বিচার করলেও দেখা যাবে যে পুঁজিবাদকে বাঁচিয়ে ওরা পরিবেশকে মেরামত করতে চায়, যা কার্যত অসম্ভব।. গ্রীন ট্যাক্স, কার্বন ট্রেডিং আসলে দূষণ ঘটানোর আইনসম্মত অধিকার। একটি ডাচ কোম্পানী যেমন সম্প্রতি নেদারল্যান্ডসে একটি ৬০০ মেগাওয়াটের তাপবিদ্যুৎ প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় কার্বন সিকিউরিটি সংগ্রহের উদ্দেশ্যে উগান্ডায় ২৫০০০ হেক্টর জুড়ে গাছ লাগানোর প্রকল্প করছে। আর তার জন্য পূর্ব উগান্ডার মাউন্ট এলগন অঞ্চলের বেনেট উপজাতির লোকেরা উদ্বাস্তুতে পরিণত হয়েছে। বোঝাই যায় কার্বন ট্রেডিং অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দুনিয়ার শাসক পুঁজিপতিদের সামনে উন্নত দুনিয়ার দাক্ষিণ্যের সুযোগ এনে দিলেও, ব্যাপক জনগণের এর থেকে কী আশা করার আছে?

কোপেনহেগেন সামিট-এর ব্যর্থতা দিয়ে লেখা শুরু করলেও এটা বলা জরুরী যে এই কর্মকাণ্ড পুঁজিবাদ বিরোধী লড়াই-এর সামনে কিছু ইতিবাচক ইঙ্গিত রেখে গেছে। এই সামিট চলাকালীন এর বিরুদ্ধে যে প্রতিবাদ আন্দোলন হয়েছে প্রথমত তা প্রমাণ করে যে, বিশ্ব উষ্ণায়ণ ও তার ফলাফল নিয়ে বিতর্ক জারি থাকবে। বেলা সেন্টারের চারপাশে এবং কোপেনহেগেন শহরের বিভিন্ন প্রান্তে কয়েক লক্ষ মানুষের সমাগম হয়েছিল। ৬৭টি দেশ থেকে ৪৩৮ টি বিভিন্ন সংগঠনের মানুষ এসেছিলেন এই প্রতিবাদ বিক্ষোভগুলোতে সামিল হতে। বড় বড় পরিবেশবাদী সংগঠনগুলো ছাড়াও ওখানে জড়ো হয়েছিল স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, যুব সংগঠন, সোস্যাল ডেমোক্র্যাটরা, লেফট-রিফর্মিস্টরা, সমাজতন্ত্রীরা, ট্রেড ইউনিয়নেরা প্রমুখ। এই বিক্ষোভের মধ্যে সরাসরি পুঁজিবাদ বিরোধিতার উপাদানগুলো বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সবচেয়ে বেশী চোখে পড়ার মতো যে ব্যানারটি ছিল, তা হল, 'change the system—not the climate'। বিক্ষোভের নিশানা যেমন ছিল পুঁজিবাদী, সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলি, তেমনই ছিল বৃহৎ পুঁজিপতি সংস্থাগুলোও। এটাও এই আন্দোলনে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। এই বিক্ষোভের মধ্যে দিয়েই বোঝা গেছে পরিবেশের আন্দোলন ভবিষ্যতে কোন খাতে বইতে চলেছে। তা যে শুধু আর বিশুদ্ধ পরিবেশ দূষণ নিয়েই হৈ চৈ করবে না, বরং আঘাত করবে বিশ্বব্যাপী পুঁজিবাদকেই, তার লক্ষণ পরিষ্কার। একই সঙ্গে এটাও স্পষ্ট, খুব দ্রুতই এই আন্দোলন আন্তর্জাতিক চরিত্র অর্জন করতে চলেছে। সে কারণেই এই বিক্ষোভের ওপর নেমে এসেছে রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন, কয়েক হাজার মানুষ গ্রেপ্তার হয়েছে, তাদের ছোট ছোট কুঠুরিতে দমব- করা অবস্থায় আটকে রাখা হয়েছিল, মলমূত্র ত্যাগের কোনো সুবন্দোবস্ত ছিল না। এই ঘটনার প্রতিবাদেও বিক্ষোভকারীরা সামিল হয় সেখানে। শাসককুলের পক্ষ থেকে র‍্যাডিকালদের আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন করার অপকৌশলও নেওয়া হয়। আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণীকে এগিয়ে এসে নেতৃত্ব দিতে হবে এই লড়াইয়ের। মাস স্ট্রাইক করে অর্থনীতিকে পঙ্গু করে দিতে পারলেই বর্তমান সামাজিক চাপ পরিণত হবে অর্থনৈতিক চাপে। এই গ্রহকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে শ্রেণীসংগ্রামের মধ্য দিয়ে পুঁজিবাদের পরাজয় ঘটানো ছাড়া অন্য রাস্তা নেই।